সংস্কৃতশাস্ত্রকারগণের দৃষ্টিতে নারীর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য

ঝণ্টু দাস [1*]

[1*] শোধছাত্র (সংস্কৃত বিভাগ), রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, Email: jhantudas231291@gmail.com

ভূমিকা :-

ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিকাল হতেই স্ত্রী-জাতির একটি মহত্বমণ্ডিত স্থান আছে । স্ত্রীজাতি ব্যতিরেকে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতেই পারে না । এই সৃষ্টির পশ্চাতে শিশুর বিকাশ, পারিবারিক স্থিতির নির্মাণ এবং সম্পূর্ণ সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, স্ত্রী হল মমতা এবং ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি । বর্তমানযুগে যখন আমরা প্রাচীন বৈদিক চিন্তাধারা, বিচারপদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের পরিত্যাগপূর্বক নিজের পূর্বপুরুষদের গরিমাময় পরম্পরা, শান্ত-বিচারধারা, তথা 'বসুধৈব কুটিম্বকম্' - এই ভাবনার বিস্মরণ ঘটিয়ে থাকি । বর্তমানের এই অশান্তময়, ভৌতিকময় জীবনধারায় সংক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি । তখনই প্রাচীন যুগের বিচার সমূহ এবং আদর্শের জ্ঞান আমাদের পক্ষে পরম আবশ্যক হয়ে পড়েছে যেগুলি ক্রমবদ্ধারূপে একান্তভাবেই মানবের পরমানন্দের প্রাপ্তি ঘটিয়ে সমস্ত জগৎ সংসারকে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', ইত্যাদির উপদেশ দান করেছে । সীতা, তারা, গান্ধারী, দেবকী, বাসবদত্তা পদ্মবতী প্রমুখ রামায়ণীয়, মহাভারতীয় ও পৌরাণিক স্ত্রীচরিত্রগুলি কতটা আদর্শপরিপূর্ণ এবং গরিমামণ্ডিত ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দুর্যোধন নিরন্তর নিজের জননীর কাছ থেকে বিজয় লাভের আর্শীবাদ প্রাপ্তির অভিলাষ করে, কিন্তু মাতা গান্ধারী যিনি 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই আর্শীবাদ অতিরিক্ত তাকে আর কিছুই দেন না । কারণ, তাঁর প্রিয় পুত্র ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করে ন্যায়প্রিয় পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রয়াস করছিলেন । এমতবস্থায় ন্যায়প্রিয় একজন ভারতীয় স্ত্রী, কী প্রকারে তাঁর সন্তানকে 'বিজয়ী ভব' এইরূপ আর্শীবাদ দিতে পারেন ? এখানে স্ত্রী চরিত্রের এই প্রকার আদর্শকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মূল উদ্দেশ্য হল আজকের বর্তমান কালের সমাজ যাতে অনুধাবন করতে পারে যে, - প্রাচীন আদর্শের বিস্মরণের ফলে আমরা কী প্রকার অশান্তিময় জীবন-যাপন করছি, এখানে আমরা সন্তানদের সমুচিত পালন পোষণ না করে, তাদের সমুচিত নীতিজ্ঞান, আদর্শ প্রদান না করে স্বয়ং ক্ষণভঙ্গুর এবং বিদীর্ণ জীবন-যাপনে প্রবৃত্ত হচ্ছি, তথা স্বার্থ পরবশ হয়ে সন্তানের ভালো-খারাপ কর্মে তাকে সহযোগ প্রদান করে । ক্রমশঃ সমাজে এক উচ্ছশৃঙ্খল পরিস্থিতির আবহ সৃষ্টি করে চলেছি । তাই মুক্তির আমাদের এই নারীর স্বরূপ বুঝতে হবে এবং তাদের গরিমা স্মরণ করতে হবে তবেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে হবে ।

নারীর মূল্য :-

মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু । কেন না তাহা দুষ্পাপ্য । এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয় । কারণ, সংসারে ইনি দুষ্পাপ্য নহেন । জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই । কিন্তু যদি কখনো ঐটির একান্ত অভাব হয় । তখন রাজাধিরাজও বোধ করি, এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ট রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না । তেমনি ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে – আজ নহে । আজ ইনি সুলভ ।

কিন্তু দাম যাচাই করিবারও একটা পথ পাওয়া গেল । অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী কখন, কী অবস্থায়, কোন সম্পর্কে, কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করতে পারলে নগদ আদায় হোক আর না হোক, অন্ততঃ কাগজে লিখে হিসেব-নিকাশ করে ভবিষ্যতে একটা নালিশ-মকদ্দমারও দুরাশা পোষন করতে পারা যায় । একটা উদাহরণ দিয়ে বলি । সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলে স্ত্রীটি বেশী দামী । আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতটা চরিয়া যায়, স্ত্রী যখন আসন্নপ্রসবা, যখন রান্না-বান্নার লোকসভা এবং যখন শিশুকে কাক দেখিয়ে, বক দেখিয়ে দুইটি খাওয়ানো চাই । তা হতে পাওয়া যাচ্ছে – নারী ভগিনী সম্পর্কে বিধবা অবস্থায়, নারী ভার্যা সম্পর্কের অপেক্ষা অল্প মূল্যের । ইহা সরল স্পষ্ট কথা । এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না ।

নারীত্বের মূল্য কী ? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে-কষ্টে মেটনা । অর্থাৎ, তাঁহাকে নিয়ে কী পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে । এবং কী পরিমাণে তিনি রূপসী । অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখতে পারবেন ।

সতীত্ব এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া – এদুটি পুরুষের কাছে বেশ উপদেয় । এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামামণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে য়ো কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়ছে । এনিয়ে যে অদ্যাবধি কত তর্ক হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । এখানে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন । কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা – এটা নারীরই জন্য । নারীর জন্য সতীত্ব ! পুরুষের জন্য নয় ! এ সতীত্বের চরম দাড়িয়ে ছিল – সমরণে ! রামায়ণে স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যা বোধ করি একবার রাগ করে সহমরণে যাবেন বলিয়া ভয় দেখিয়ে ছিলেন । কিন্তু শেষে তাঁর রাগ পরে গিয়েছিল । দশরথকে একাই দগ্ধ হতে হয়েছিল । আবার মহাভারতে মন্ত্রী ভিন্ন আর সে কেহ একাই করেছিল, তাহা বলতে পারি না । অন্ততঃ পুরুষ সে তখনও উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই, তাহা নিশ্চিত, অথচ দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্তিস্তম্ভ যথেষ্ট অর্থাৎ স্ত্রীকে পরলোকের সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইত । আমাদের এদেশেও মূল কারণ বোধ করি, ইহাই । যাঁরা অশোক রাজার রাজত্ব দেখেছিল, তারা বলে সে সময়ে বিধবাকে দগ্ধ করার প্রথাটা আর্যাবর্তে ছিল না । দাক্ষিণাত্যে ছিল । কিন্তু আর্যাবর্তের আর্যরা যেই খবর পাইলেন, অসভ্যেরা অসভ্য হউক । যাই হউক, বড় মন্দ মতলব বাহির করে নাই – ঠিক তো ! পরলোকে যদি সত্যই কিছু থাকে, তো সেখানে সেবা করে কে ? অমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, এবং এত বিধবাকে দগ্ধ করিলেন যে, স্পেনের ফিলিপেরও বোধ করি লোভ হইত । কিন্তু একদিন যাহাকে বংশের হিতকামনায় সবের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, যাহার জন্য হয়ত যুদ্ধ করিয়াছি, ছলনা, মিথ্যা, এমনকী চুরি পর্যন্ত করিয়াছি, এমন এতবড় উপকারী জীবটাকে এমন হত্যা করি কেমন করে ? এর কারণ আছে । প্রথমতঃ পরলোকে সেবা করবে কে ? দ্বিতীয়তঃ ভাগ্যদোষে সে স্ত্রী বিধবা হইয়া গেল, তাহার দ্বারা আর কী বিশেষ কাজ পাওয়া যাইবে ? বরং ভবিষ্যতের অশান্তি উপদ্রবের সম্ভবনা, অতএব সময়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । এখানে মনে রাখা ভালো যে, নারী ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা সম্বন্ধ বিশেষেই দামী, অন্যথা নহে ।

ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় যে, বিধবা বিবাহ জগতের কোন দেশে, কোনদিন সমাদর পাইনি । কম বেশী সকলেই একে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছেন । কিন্তু আমাদের সুলভ এই প্রাচীনদেশ, যে দেশে আত্মার স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হয়ে গিয়াছিল, সেই দেশে পুরুষ বুঝিয়েছে সহমৃতা হওয়া সতীর পরম ধর্ম । মনুও বলিয়াছেন, এক পতিসেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় কোন কাজ নেই । সে ইহকালে পুরুষের সেবা করিয়াছে। পরকালে গিয়াও করিবে । আবার শাস্ত্রও বলিয়াছে, এক মাতৃত্বের কারণই সে পূজার্হা । যাইহোক

বহু মূল্যবান কে এই নারী কে বা তাঁর স্বরূপ কি ? সংস্কৃতশাস্ত্রকারগণ কি দৃষ্টিতে দেখেন নারীকে – এসবের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করছি -

শাস্ত্রে ব্যবহৃত (নারীবাচক) শব্দের মধ্যে নারীর স্বরূপ :-

আদিকাল ধরেই নারী মানবসমাজের প্রধান নায়িকার ভূমিকা পালন করে আসছে । মাকরসার জালের ন্যায় বিশ্ব ইতিহাস নারীকে কেন্দ্র করে তার চারিপার্শ্বে প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয় । চিরকালধরেই নারী আপন যুগসভ্যতার প্রতীক হয়ে এসেছে । নারীকে পেয়ে ধন্য হয়েছে আমাদের সাহিত্যসমাজ । কবিদের দৃষ্টিতে নারী মায়ার ন্যায় দুর্বোধ, প্রকৃতির ন্যায় বহুমুখী, তথা সহানুভূতির ন্যায় সহজ-সরল ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে জাগতিক অন্যান্য রহস্যময় বস্তুর ন্যায় নারীকেও রহস্যময়ীরূপে চিহ্নিত করা যায় । বিষয়ভিত্তিক সমাজে বিষমস্থিতির কারণে নারীর স্বরূপ বিভিন্ন রকমের হয় । নারী শব্দের পর্যায়বাচক কিছু শব্দের সাহায্যে নারী শব্দের সামান্য ও কিছু বিশেষ স্বরূপের উল্লেখ এখানে করা হল –

ক) স্ত্রী - 'নারী' বোধক সর্বাপেক্ষ অধিক প্রচলিত শব্দ হল 'স্ত্রী' । ইহা বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভের সাথে সাথে পালি ও প্রাকৃতের যুগেও অধিক সজীব ছিল । স্ত্রী শব্দটি 'স্ত্যৈ' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে । যাস্কাচার্যের মতে, এর অর্থ হল লজ্জার দ্বারা সংকোচন/সংকুচিত হওয়া । 'স্ত্রী'কে 'স্ত্রী' – এই জন্য বলে কারণ, তা হল লজাতী – 'স্ত্রিয়ঃ স্তায়তে অপত্যবয় কর্মণঃ ।'[1] - এর ব্যাখ্যানকালে দূর্গাচার্য লিখেছেন – 'লজ্জার্থস্য লজ্জনতেঽপি হি তাঃ' - অর্থাৎ নারীর স্ত্রী সংজ্ঞা উহার লজ্জাশীলতার কারণেই । কিন্তু পাণিনি ধাতুপাঠে 'স্ত্যৈ' ধাতুর লজানা অর্থ নয় বরং শব্দ করা বা একত্রিত করা – এরূপ অর্থে পাওয়া যায় 'স্ত্যৈ শব্দসংধাতয়োঃ'[2] । অতঃপর পতঞ্জলি 'স্ত্যৈ' ধাতুটিকে আধার করে বলেছেন – নারীকে 'স্ত্রী' বলা হয়, কারণ গর্ভের স্থিতি নারীর ভিতরেই হয় । ('স্ত্যায়তি অস্যাং গর্ভ ইতি স্ত্রী' – মহাভাষ্য) ক্ষীরস্বামীও এইরূপ অর্থ করেছেন । পতঞ্জলী 'স্ত্রী' শব্দের আর একটি ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন – 'শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাং গুণানাং স্ত্যানং স্ত্রী' - অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এসবের সমুচ্চয় হল স্ত্রী । মহাভাষ্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার কৈয়ট-এর মতে শব্দস্পর্শাদি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণের পরিণাম । এই তিনটি গুণের আর্বিভাব পুংস্ত্বের, তিরোভাব স্ত্রীত্বের এবং স্থিতি নপুংসকত্বের দ্যোতক । নাগেশভট্ট কৈয়টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন । বামনশিবরাম 'স্ত্রী' শব্দটিকে নারীর পর্যায়বাচক মেনে 'স্ত্যায়তে শুক্রশোণিতে যস্যাম্' - এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করেছেন (স্ত্যৈ+ইট্+ঙীপ্)[3] । মোনিয়র বিলিয়ম-এর শব্দকোশে 'স্ত্রী' শব্দটিকে সূতিকি শব্দের সাথে যুক্ত করে তার অর্থ করা হয়েছে (সূতিকা – সৌত্রী স্ত্রী, মোনিয়র উলিয়াম-এর শব্দকোশ) । ঋগ্বেদের (১/৬/২৬) টীকায় যাস্কাচার্য বলেছেন – 'স্ত্রিয়ঃ এব এতাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধহারিণ্যঃ' অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় । সমস্ত পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি একমাত্র স্ত্রীরদ্বারা একই সাথে একই সময়ে হয় । অর্থাৎ স্ত্রীশব্দ, স্ত্রী-স্পর্শ, স্ত্রী-রূপ, স্ত্রী-রস, স্ত্রী-গন্ধ – এইভাবে এই লীলাময় জগতে স্ত্রী নিজের অনির্বচনীয় সুষমা আর অনুপম আকর্ষক শক্তির জন্য সুবিদিত আছে ।

---

[1] নিরুক্ত ৩/২২/২

[2] ধাতুপাঠ, ২/৯৩৫

[3] সংস্কৃত হিন্দীকোশ । পৃ. ১১৩৮, বামনশিবরাম আপ্টে

(খ) নারী – ঋগ্বেদে 'নারী' শব্দের প্রয়োগ না পাওয়া গেলেও যজ্ঞের অর্থে 'নার্যঃ' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, যা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে তথা শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায় । 'নারী' শব্দ 'নৃ' অথবা 'নর' শব্দ থেকে উৎপন্ন । নৃ+অচ্+ঙীন্ – নারী । নর+ঙীষ্ – নারী । যাস্ক 'নর' শব্দের নৃৎ-নাচনা ধাতু থেকে ব্যুৎপত্তি করেছেন । 'নরাঃ মনুষ্যাঃ নৃত্যন্তি কর্মসু'[4] । 'নৃ' ধাতুর অর্থ দান, দেনা, বীরতার কর্ম তথা নেতৃত্ব দানের অর্থে করা হয়েছে । স্ত্রী বা নারীরা যুদ্ধ তথা শিকারে বীরেদের সহায়িকার ভূমিকা পালন করত এছাড়াও তারা অতিথি এবং ভিক্ষুকদের সৎকার, মাঙ্গলিক কর্তব্য সম্পাদন করত । ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কোনো কোনো স্থলে নারীপাঠ পাওয়া যায় । সায়ণের মতে নারীর ভার নরের উপকারক অথবা শত্রু নয় এরূপ হয় – 'নৃণাং মহাবীরার্থিনাম্ উপকারীত্বাৎ নারিঃ । ন অরিঃ নারিঃ ।'[5]

(গ) বামা – স্ত্রী-কে বামা বলা হয়, কারণ তা সৌন্দর্য বিস্তারিত করে । 'বয়তি সৌন্দর্যম্' (বমূ+অণ্+টাপ্) । বামা দেবী দূর্গার এক নাম ।

'বাঞ্চং বিরুদ্ধরূপং তু বিপরীতং তু গীয়তে ।

বামেন সুমদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ ।।'[6]

(ঘ) মহিলা – 'মহিলা' শব্দটি মহ্+ইলম্+টাপ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন । এখানে 'মহ্' এর অর্থ হল – পূজা করা অর্থাৎ পূজ্য হওয়ার কারণে স্ত্রীর অন্য নাম মহিলা । আধুনিককালে কেউ কেউ বলেন মহলে (প্রাঙ্গেন/কক্ষে) থাকেন বলে নারীকে মহিলা বলা হয় ।

(ঙ) পুত্রী – পুত্র শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ হল 'পুত্রী' । পুত্র+ঙীপ্ – পুত্রী । মনুর মতে পুত্র বা পুত্রী 'পুত্' নামক নরক থেকে পিতাকে রক্ষা করে । পুত্রীকে সুতা, বালা, দূহিতা, মধ্যমিকা, জামা প্রভৃতি পদের দ্বারাও অভিহিত করা হয়ে থাকে ।

'পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ ।

তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।।'

(চ) মেনা – এটি একটি বৈদিক শব্দ । ঋগ্বেদে নারীর অর্থে মেনা শব্দের প্রয়োগ আছে । মহর্ষি যাস্কাচার্যের মতে, এর ব্যুৎপত্তি হল 'মানয়ন্তি এনাঃ' (পুরুষাঃ) মান+ইনংচ[7] অর্থাৎ 'মেনা' পুরুষের দ্বারা আদরণীয় হয় । তাই স্ত্রীদের 'মেনা' বলা হয় । তবে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যে 'মেনা' শব্দটি 'মান্যা' শব্দে পরিণত হয়েছে ।

---

[4] নিরুক্ত – ৫/১/৩

[5] সায়ণ – তৈ. আ. ৪/২/১

[6] দেবীপুরাণ – অধ্যায়, ১/৪৬

[7] নিরুক্ত – ৩/২১/২

মেনা-মানা-মান্যা । এছাড়াও পর্বতরাজ হিমালয়ের পত্নী তথা পার্বতীর মাতার নাম মেনা – 'মেনাং মুতিনামম্ অপি মানয়ীয়াম্ ।'[8]

(ছ) জোষা – এই শব্দটি 'যোষা'-র সাথে তুলনীয় । যার অর্থ হল – নারী, - 'যে জুষ্যতে উপভূজ্যতে' ইতি জুষ্+ঘঞ্+টাপ্ – জোষা । এরই নামান্তর হল জোষিৎ, হোষিকা ।

(জ) দারা – পত্নীর অর্থে 'দারা' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতসাহিত্যে বহুশঃ দেখা যায় । যেমন – 'এতে বয়ময়ী দারাঃ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্'[9] ।

দারা শব্দটি 'দৃ-দীর্ঘতে' – ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে । অর্থাৎ পত্নী পুরুষের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, তাই তাকে 'দারা' বলে ।

(ঝ) পত্নী – পত্নী পতির সুখ দুঃখের সাথী, তাই সে সমী, জীবনের শেষ পর্যন্ত পুরুষের সাথে সাথে চলে বলে তাই সে সহচরী, পুরুষের ধর্ম-কর্মের সমভাগীদার, তাই সে সহধর্মিণী, (পতি+ঙীষ্-নুগাগম – পত্নী,[10])

(ঞ) গৃহিণী - পত্নী গৃহের যাবতীয় কার্যভার যথাযথ পালন করেন, তাই তাকে 'গৃহিনী' বলা হয় । গৃ+ইনি+ঙীপ্-গৃহিনী । পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে –

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহমুচ্যতে ।

গৃহং তু গৃহিনীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে ।।'

অর্থাৎ গৃহ তো গৃহিনীর দ্বারা সম্পূর্ণ হয় । গৃহিনী বিনা গৃহ কান্তিহীন হয়ে পড়ে ।

(ট) মাতা – নারীর মাতা রূপটি সর্বদা পূজনীয় । ঋগ্বেদে মাতৃ শব্দ অন্তরিক্ষ, নদী, জল তথা পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । বৈয়াকরণ মতে, মাতৃ শব্দটি মান্+তৃচ্ প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে । (মান্ পূজায়াং তৃচ্ ন লোপঃ) । এখানে 'মান্' এর অর্থ হল 'আদর' । অতঃ 'মাতৃ' শব্দের অর্থ হল নির্মাতৃ-নির্মাণ করেন যিনি সেই জননীকে বোঝায়, যার স্থান স্বর্গের চেয়েও উন্নত, শ্রেষ্ট ও পূজনীয় - 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' ।

(ঠ) গণিকা – এমন স্ত্রীদের গণিকা বোঝায়, যারা নিজেদের গুণ অথবা লাবণ্যের উপর আশ্রয় করে (সাহায্যে) জীবিকা উপার্জন করে । 'গুণানুরক্তা গণিকা' (মৃচ্ছকটিকম্) ।

(ড) বেশ্যা – এমন এক ধরণের স্ত্রী, যারা নিজ বেশের উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করে, যাদের কাছে সকল মানুষের অবাধ আনাগোনা বা প্রবেশাধিকার থাকে, তাদের সাধারণতঃ বেশ্যা বলা হয়ে থাকে । বেশেন পণ্যযোগেন জীবতি (বেশ্যা – বেশ্+যৎ+টাপ্), দারিকা, মুক্তা, লজ্জা, বিলাসিনী প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বেশ্যাকে বোঝায় ।

---

[8] কুমারসম্ভবম্ – ১/১৮-৫/৫

[9] কুমারসম্ভবম্ – ৬/৬৩

[10] পাণিনিসূত্র, ৪/১

নারীর উপযুক্ত পর্যায়বাচক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নারীর কিছু চিরন্তন সত্যের নির্দেশ করে থাকে । এর মধ্যে কিছু কিছু শব্দ নারীর ভৌতিক স্বরূপের দ্যোতক । স্ত্রী হল সৃষ্টির সাধন তথা প্রকৃতির মূর্তস্বরূপ । নারী অবলা হলেও, সে কোমল-কান্ত-কমনীয় প্রকৃতির । নারীর মধ্যে রমনীয় সৌষ্ঠব, কামিনীর বাসনা, ভীরুর শঙ্কা, আর প্রমদার মদ যা মত্ততা – এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্মিলিতভাবে থাকে । স্ত্রী হল শোভা, রমণীয়তার জন্য অন্য নাম হল নারী । নারীর মধ্যে সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের মধ্যে প্রেম, প্রেমের মধ্যে অনন্যতা আর অনন্যতার মধ্যেই আছে পরিপূর্ণ আনন্দ । যেমন – জ্যোতির পশ্চাতে অন্ধকার, রৌদ্রের পশ্চাতে ছায়া, ঠিক তেমনি নারীর রম্যতার পশ্চাতে চঞ্চলতা, তার প্রেমের আড়ালে ঘৃণা, তার করুণার পশ্চাতে ক্রুরতা, আর তার আনন্দময় রসের পশ্চাতে বিষাদের বীজ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে । কিন্তু, নারীর মধ্যে এত প্রকারের রূপের অবস্থান মানব তখনই জানতে পারে, যখন সে নিজ স্বার্থপরতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে মানব, নারীর আধ্যাত্মিক স্বরূপকে ব্যক্তকারী শব্দগুলির দ্বারা নারীকে সম্বোধিত করে থাকে । নারী হল শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা । নারী হল শক্তির আধাররূপিণী । বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীস্বরূপা । তার প্রসন্নতায় সুজন, তার দ্বৈধীতে স্থিতি, এবং তার আহ-কে প্রলয় বিরাজমান । নারী হল মান্যা, পূজ্যা তথা আরাধ্যা । নারীর মোহে থাকে স্নেহ বন্ধনে দান আর জীবনে উৎসর্গ । নারী হল শক্তি ও শ্রদ্ধারূপিণী, যা অপূর্ণতেও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ । তাই বলা হয়ে থাকে –

‘প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চগেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ।।’[11]

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর স্বরূপ :-

প্রতিটি কালের সমকালীন সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলনকে অস্বীকার করা যায় না । কারণ আমরা জানি যে – লেখক তার রচিত সাহিত্যে শিল্পের সৃষ্টি করেন, তা তাঁর সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে উৎপন্ন হয় । কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, আদিকবি বাল্মীকি ও কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের রচনায় যে সমকালীন প্রতিফলন থাকবে তা বলাই বাহুল্য । কারণ সমাজ জীবন হল একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক প্রণালী । যা একযুগ থেকে অন্য অর্থাৎ যুগান্তরে প্রবাহিত হয় । সুবিশাল সংস্কৃতসাহিত্যে যে সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ পুরুষশাসিত সমাজ, তথাপি সেখানে নারীর অধিকার নগণ্য ছিল না, বরং অধ্যায়নে, শাস্ত্রচর্চায়, শাস্ত্রবিচারে সম্পত্তির অধিকার লাভ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বৈদিকসমাজে নারীর পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতেন । তখনকার যুগে নারীরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল, হ্যাঁ, কোথাও কোথাও সেই অধিকার রক্ষিত হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও তা লঙ্ঘিত হয়েছে । তারই একটি আলোচনা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি ।

মাঝে মাঝে বক্তৃতায় বা বেতারে শোনা যায়, প্রবন্ধে বা বইয়ে পড়ি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুব উঁচতে ছিল, বৈদেশিক আক্রমণের পরই নাকি নারীর স্থান সমাজে নীচে নেমে যায় । একেবারে প্রাচীন, অর্থাৎ বৈদিকযুগেই নাকি নারীর স্থান উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল, বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাই বুঝতে হবে । এই সাহিত্য প্রধানতঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও সূত্রসাহিত্য অর্থাৎ শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মগ্রন্থই প্রধানতঃ । আধুনিক সমস্ত পণ্ডিতই প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদে খ্রীঃ পূর্ব দ্বাদশ

[11] মনুস্মৃতি, ১/২৬

শতক থেকে দশমের শেষ বা নবম শতকের শুরুর রচনা বলে মনে করেন । খ্রীঃ পূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক – এই দেড় হাজারের কিছু বেশী সময়ের সাহিত্যে সমাজের যএ চিত্র সংগ্রহ করা যায়, তারই মধ্যে আমরা নারীর স্থান অনুসন্ধান করবো ।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এদেশে এসে যাযাবর থেকে গ্রামীণ মানুষ হয়ে উঠে । পোড়া ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী করে থিতু হয়ে এক জায়গায় বসবাস করতে থাকে । যাযাবরদের সমাজব্যবস্থা ছিল গোষ্ঠী ও কৌমে বিভক্ত । ক্রমে কৃষিজীবী হবার পর ঐ সমাজ গঠন ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে । ক্রমে ক্রমে 'কুল' – এর প্রবর্তন হয় । অর্থাৎ একটা বাড়িতে তিন-চার পুরুষের পল্লবিত বৃহৎ-পরিবার । তারপর আসে যৌথ পরিবার, পুরুষের সম্পর্কে ধরে দু-তিন পুরুষের পরিবার, সবশেষে একক-পরিবার, এক-পুরুষের সংসার । এসবের সঙ্গেই উৎপাদন-ব্যবস্থার ঘনিষ্ট যোগ ছিল । কিন্তু একটি ব্যাপার ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল, সমাজে শুদ্র ও নারীর স্থানের অনিবার্য অবদান । অর্থাৎ ক্রমেই নারীর স্থান সমাজ ও তার পরিবারে নেমে যাচ্ছিল । যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল, তবু তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিতা এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয় । এখানে মনে রাখতে হবে (মনে রাখা জরুরী) যে, 'ভূত্য' এবং 'ভার্যা' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই অর্থাৎ যাকে ভরণ করতে হয় । যেহেতু স্ত্রী স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করে না । (করতে পারে না) তাই সে 'ভরণীয়' । এছাড়াও, বৈদিক যুগে অনেক বৈদেশিক জাতির আক্রমণের প্রভাববশতঃ নারীহরণ, নারীর সম্মানহরণ তথা বর্ণসংকরের আশঙ্কায় নারীকে আরো অন্তঃপুরের গহনে ঠেলে দেওয়া হয় । অর্থাৎ এককথায় ঘরে বা বাইরে শেখানেই কখনো কোন বিপত্তি দেখা দিয়েছে, তখনই সেখানে নারীকে তার দায়ভার গ্রহণ করতে হয়েছে । এইভাবেই ক্রমে ক্রমে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে । ঋগ্বেদে সর্বোপরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন উক্তি না পাওয়া গেলেও ঋগ্বেদের রচনার বেশ কয়েকটি মন্ত্রের রচনায় এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তখন (সেযুগে) নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী ছিল । যেমন – দেবী ঊষা কোনও মন্ত্রে সূর্যের বধূ । কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা, বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহশ্রী উৎঘাটন করছেন । কখনও বা শুনি ঊষা স্থিতহাসিনী, নববধু যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, ঊষা তেমন করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করেছেন । আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায়, হে ভগদেব, তুমি যেন আমাতে তেমনই সুখী হও ।

বিবাহে কন্যা পণের কথা পাওয়া যায়, ইন্দ্র আর অগ্নি উক্তকে ধন দেন, অবাঞ্চিত জামাতা যেমন, প্রচুর ধন দিয়ে শ্বশুর রাড়ির লোকেদের অনুকূল করে তার প্রীতিভাজন হয় । পুরুষের বহু পত্নীত্বের কথা কখনো স্পষ্টতঃ কখনো গৌন । কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে বরপণের কথা আছে একাধিকবার । পরবর্তীকালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল । ঋগ্বেদের যুগে তা ছিল না । ঋগ্বেদে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার কোনো উল্লেখ নেই । বিধবা বেড়েই থাকতো, কখনো বা দেতবের সঙ্গে তার বিয়ে হত, আর কখনো বা আর বিয়ে হতই না । সে যাই হোক, তাঁর বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয় নি, ধর্ম বা সমাজের দোহাই পেয়ে পুড়িয়ে মারাও শুরু হয় নি । দ্বিতীয়বার বিয়ে তা দেওয়া ছাড়া অন্যকেও এই অধিকারও স্বীকার করা হয়েছিল ।

যজ্ঞে যজমানের পত্নী পাশে থাকতেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে । তাঁর উপনয়ন নেই, অতএব – 'ন স্ত্রী জুহুয়াৎ' – নারী হোম করতে পারবে না'[12] । অর্থাৎ নারীর ভূমিকা এতটাই নিষ্ক্রিয় ছিল যে, রামচন্দ্র সোনার সীতা গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতে পেরেছিলেন । গৌতমধর্মসূত্র-তে শুনি – 'অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী' – ধর্মাচরণে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই (১৮/১) ।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বর্ণিত নারীর মাহাত্ম্য :-

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী উন্নত গৌরবের অধিকারিণীরূপে সদা-সর্বদা বিরাজমান । এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা নিজেকে দুটি রূপে বিভক্ত করেন । বামভাগে সে স্ত্রী এবং দক্ষিণভাগে সে পুরুষ –

'স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধরূপো বভূব ।

স্ত্রীরূপো বামাভাগাংশো দক্ষিণাংশ পুমান্ স্মৃতঃ ।।'

ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস তথা প্রাচীন সংস্কৃতির দ্বারা স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী মানা হয়েছে । ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে প্রত্যেক পুরুষ – 'যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধো ভবেৎ পুমান্ '[13] । পদ্মপুরাণ অনুসারে যেখানে সতীস্ত্রী বিরাজমান থাকে, সেই স্থান নিঃসন্দেহে তীর্থস্থানে পরিণত হয় । যে গৃহে পতির দ্বারা পত্নী এবং পত্নীর দ্বারা পতি সন্তুষ্ট থাকে, সে গৃহে সদা কল্যাণ প্রাপ্তি হয় –

'যত্র তুষ্যতি ভত্রা স্ত্রী স্ত্রিয়া ভর্তা চ তুষ্যতি ।

তত্র বেশ্মনি কল্যাণং সম্পদ্যেত পদে পদে ।।'[14]

সেই দেশেই বিদ্বান, সাধু, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ এবং গৃহস্থ, সমস্ত লোক সামান্যতঃ ভাবে স্ত্রীজাতিকে মাতা বলে সম্বোধন করেন । সকল গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীদের লক্ষ্মীদেবীরূপে দেখা হয় । স্মৃতিশাস্ত্রাচার্যদের মতে, নারীরা সাক্ষাৎ দেবী ও লক্ষ্মীর স্বরূপ । ভগবান মনু স্ত্রীদের প্রসঙ্গে বলেছেন – যে, পিতা, ভ্রাতা, পতি তথা দেওর যদি নিজের বিশেষ ভালো চায় তাহলে উচিত হবে কী তারা স্ত্রীদের যেন আদর ও যথোচিত সম্মান করে, এবং তাদের যেন আভূষণের দ্বারা সদা বিভূষিত রাখে ।

'পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা ।

পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ।।'[15]

এমনকী আমরা দেখি যে, শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতাতেও মনু মহারাজের পত্নী পুত্রেষ্টি যজ্ঞকালে কন্যাসন্তানের জন্য যাচনা করেছিলেন ।

---

[12] আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ২/৭/১৫/১৭

[13] ব্যাস সংহিতা ২/১৪

[14] স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৪০/৬০

[15] মনুস্মৃতি, ৩/৪৪

'তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাতে ।

দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা ।।'[16]

ধর্মসূত্রে মাতাকে শ্রেষ্ট গুরুর মর্যদা দেওয়া হয়েছে । কারণ, সন্তান তার প্রারম্ভিকশিক্ষা মাতার কাছ থেকেই গ্রহণ করে – 'নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ'[17] ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ষোল প্রকার মাতার উল্লেখ পাওয়া যায় । যাদের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা মানবজাতির অবশ্যকর্তব্য । এরা হলেন যথাক্রমে – স্তনদুগ্ধ পান করান যিনি অর্থাৎ ধায়, গর্ভধারণকারিণী অর্থাৎ জননী, ভোজন দেন যিনি অর্থাৎ পাচিকা, গুরুপত্নী অভিষ্ট দেবতার পত্নী অথবা পিতার পত্নী অর্থাৎ সৎ মাতা, কন্যা, বোন, পুত্রবধূ, পত্নীর মাতা অর্থাৎ শাশুড়ি, মায়ের মাতা অর্থাৎ ঠাকুরমা, সহোদর ভাই এর পত্নী, মায়ের বোন অর্থাৎ মাসী, পিতার বোন অর্থাৎ পিসি তথা মামী ইত্যাদি মানুষ্যসমাজের বেদবিহিত মাতারূপে সম্বোধিত ।

'স্তনদাত্রী গর্ভদাত্রী.....মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ।।'[18]

বস্তুতঃ নারী কখনো কন্যারূপে, কখনো পত্নীরূপে আবার কখনো বা মাতারূপে পরিবার তথা সমাজের প্রতি আত্মোৎসর্গ করে থাকে । এইভাবে নারীর বিভিন্ন রূপের সংকলন থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, নারী নরের নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং তার সংবর্ধন করে । নারী পতিব্রত ধর্মের পালন করে । প্রিয় কথা বলে তাই সে প্রিয়া, নারী ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, পুত্রের জন্ম দেয় তথা কুলের রক্ষা করে তাই তাকে কুলীন স্ত্রী বলা হয় । এছাড়া তাকে গর্ভধারিণী মাতা বলা হয় । আবার নারী দয়ারূপী ভগিনী হয়ে যমরাজের ভয় থেকে প্রাণীকুলকে মুক্ত করে, এই ভাবে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কর্তব্য পালনের মাধ্যমে পরিবার তথা সমাজে নারীর যথেষ্ট মহত্বপূর্ণ ও গৌরবান্বিত স্থান বিরাজমান । ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে নারী হল সর্বশক্তিসম্পন্না তথা বিদ্যা, শীল, মমতা, ধন, সৌন্দর্য ও সম্পত্তির প্রতীক । স্ত্রীব্যতীত পুরুষ সম্পূর্ণ একা এবং অপূর্ণ । এখানে 'পুরুষ' শব্দের নির্মিতি স্ত্রী, সন্তান ও ব্যক্তি এই ত্রয়ের সমষ্টির ফলে হয়েছে । স্ত্রীর আগমন পুরুষের পক্ষে শুভ, মঙ্গলজনক, সৌরভময় তথা সম্মানজনক, যার সংস্পর্শে আসার ফলে পুরুষের ব্যক্তিত্ব আরোও সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে । প্রকৃতি ও পুরুষের সংসর্গের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক । প্রকৃতি বিনা পুরুষের কার্য যেমন অপূর্ণ থেকে যায়, ঠিক তেমনি একইভাবে স্ত্রী ব্যতীত মনুষ্যজীবন অপূর্ণ থাকে । অর্থাৎ নর ও নারী ব্যষ্টিরূপে পরস্পর সম্পৃক্ত ।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে এমন অনেক মাতার উদাহরণ পাওয়া যায়, যাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উৎকৃষ্টতা সমাজে এক দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে । যেমন – মাতা, সতী, দেবহুতি, আদি বিদ্বান কপিলমুনির জন্ম দিয়েছিলেন, যিনি সাংখ্যদর্শনের প্রণয়ন করে সংসারজগৎকে কৈবল্যের পথ দেখিয়েছিলেন । মাতা কুন্তী পাণ্ডবপুত্রদের ধর্মের উপর দৃঢ় আস্থা রেখে যথাযথভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম ও প্রজাপালনের উপদেশ ও আর্শীবাদ করেছিলেন । মাতা

---

[16] শ্রীমদ্ভাগবৎ – ৯/১/১৪

[17] মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১০৮/১৭

[18] ব্র.বৈ. পুরাণ, গায়পতি খণ্ড, ১৫/৩৮-৪০

গান্ধারী নিজের দুরাগ্রাহী পুত্র দুর্যোধনকে সৎমার্গে ফিরিয়ে আনার জন্য সাম-দানাদির দ্বারা রাজনীতি ও ধর্মনীতির উত্তমোত্তম উপদেশ দিয়েছিলেন, মাতা কৌশল্যা পুরুষোত্তম ভগবান রামের জন্মদানের সৌভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলেন । মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ক্রমশঃ ভরত এবং লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মতো পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন । যারা ধীরতা, বীরতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও ভগবৎভক্তির জীবন্ত আদর্শকে প্রতিস্থাপিত করে জগৎসংসারের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন । প্রাতঃস্মরণীয়া মাতা দেবকীও কলাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিয়েছিলেন । যিনি ভগবৎগীতার এবং সদুপদেশ ও কারিকাবলীর মাধ্যমে ভক্তকুলকে ভবসাগর থেকে উত্তরণের মার্গ দেখিয়েছিলেন ।

কিন্তু বিড়ম্বনার বিষয় হল এই যে, নারী বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি – একথা বললেও, সমস্ত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে নারী চিরকাল হীনমানব থেকে গেছে । প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে পুত্রী বা কন্যার জন্ম হর্ষের নয় বরং বিষাদের বিষয় ছিল । হিন্দু পরিবারে পুত্রের তুলনায় কন্যার স্থান সদা উপেক্ষনীয় ও অদর্শনীয় ছিল । পাশাপাশি কন্যার সামাজিক তথা আর্থিক অধিকারও অপেক্ষাকৃত গৌণ ছিল । শুধু তাই নয়, কন্যাকে সমস্ত প্রকারের দুঃখ ও সন্তাপের কারণ মানা হত । সমাজে তার উপর অনেক প্রকারের নিয়ন্ত্রন ও বন্ধন কায়েম করা হত । নারী বা কন্যার সম্পর্কে এরূপ কথাও প্রচলিত ছিল যে, সে নাকি জন্মের সময় থেকেই তার স্বজনদের দুঃখ দেয়, বিবাহের সময়ে সমুচিত ধন সামগ্রী নিয়ে যায়, এমনকি তরুণি দশায় অনেক প্রকার দোষে দুষ্ট নিজবংশকে কলঙ্কিত করে । তাই কন্যা চিরকাল মাতা-পিতার কাছে দুঃখের কারণস্বরূপ –

‘সম্ভবে স্বজন দুঃখকারিকা, সম্প্রদানসময়ে ধনহারিকা ।

যৌবনেঽপি বহুদোষকারিকা, দারিকা হৃদয়দারিকা পিতুঃ ।।’[19]

যাইহোক, নারীর এত অবমাননার পরও তৎকালে এমন অনেক ধর্মশাস্ত্রকারের কথা পাওয়া যায় । যারা কন্যার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তার নারী সত্ত্বাকে সম্মান ও সমাজে তার প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করেছেন । ভগবান মনু তাঁকে পুত্রের সমকক্ষ বলেছেন তথা পুত্রের অভাবে কন্যাকে পিতার উত্তরাধিকারী স্বীকার করেছেন –

‘যথৈবাত্মা তথা পুত্রাঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা ।’

এবিষয়ে নারদ ও আচার্য বৃহস্পতি মনুর মতের অনুমোদন করেছেন ।

এটা বহুল প্রচারিত যে, মহাভারত যুদ্ধের শেষে পিতামহ ভীষ্ম ৫৮ দিন ধরে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় সনাতন ধর্মের গোলকধাধায় জর্জরিত যুধিষ্টিরকে একজন ব্রহ্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বারংবার স্ত্রী জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদানের উপদেশ দান করেছিলেন ।

‘পৌরুষং বিপ্রনষ্টং মে স্ত্রীত্বং কেনাপি মেঽভবত্ ।

স্ত্রীভাবাৎকথযশ্বং তু পুনরারোঢুমুৎমহে ।।

পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ পৌরজনপদাশ্চ তে ।

---

[19] ঐতরেয় ব্রহ্মণ, ৩৩/১ এর উপর সায়ণভাষ্য-৩৩/১

কিং স্বিদং ত্বিতি বিজ্ঞায় বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।।'

এমনকি নাট্যকার ভাস তাঁর নাট্যসমূহে চিত্রিত নারীচরিত্রের মাধ্যমে মূলতঃ ভারতীয় নারীর আদর্শ তথা স্বরূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন । যার মধ্যে পুত্রীধর্ম, পত্নীধর্ম তথা মাতাধর্মের মহত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন তথা এই সমস্ত ধর্মের প্রশংসা করেছেন ।

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেমন নারীচরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ছিল, তেমনি বর্তমান সমাজেও সমাজের উন্নতিতেও তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীচরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা আছে এবং থাকবেও ।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় স্ত্রীজাতির স্থান :-

বর্তমানযুগে সর্বত্রই স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের উপর সামাজিক তথা সাংবিধানিক স্তরে বিশষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে । বিশ্বের অনেক দেশেই মহিলারা ক্রমশঃ নিজেদের দেশগণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রঙ্গনে অগ্রসর হয়েছে । ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রপতি, লোকসভাধক্ষ্য তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক স্তরে মহিলাদের সংখ্যা খুব একটা নগণ্য নহে । কিন্তু এর কিছু বছর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বজায় ছিল । তখন নারী উৎপীড়ন, কন্যাপন জনিত অত্যাচার, যৌন অত্যাচার, বধূ-হত্যা, ধর্ষণ, কন্যা ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি নিন্দানীয় এবং অত্যন্ত গর্হিত ঘটনা ঘটত না । বর্তমানে বিচার্য বিষয় হল এই যে, কী সমাজিক আর্থিক তথা সাস্কৃতিকস্তরে নারী পুরুষের ভেদাভেদ সত্যই সমাপ্ত হয়ে গেল ? তবে এটুকু অনুসন্ধন করলেই পর্দার পিছনে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে এবং সেটা হল যে, আজও লিঙ্গভেদরূপী দানব স্ব-মহিমায় সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান ।

যদিও স্ত্রীদের দেবী, অর্ধাঙ্গিনী, সম্রাজ্ঞী, দাত্রী, সৃষ্টি নির্মাত্রী প্রভৃতি বিশেষ এবং মহান সম্বোধন দেওয়া হলেও, আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সমাজিক এবং আর্থিক সমানতার অধিকার । কারণ তা হলেই সেটা পুরুষের অহংবোধের অপমানের কারণ হয়ে উঠবে, শুধু তাই নয়, যখনই কোনো মহিলার উন্নতি চোখে পড়ে, তখনই তাকে বিভিন্ন সম্পর্কের শৃঙ্খলায় এমনভাবে বন্ধন করে, যাতে তাঁর প্রগতিশীলচিত্ত ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই ছটফট করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে । ১৮৭০ থেকে আরম্ভ করে ২০০০ সালের মধ্যে অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ মহিলা সংঘ গঠিত হয় । কিন্তু এই সমস্ত, সংস্থা বা সংগঠন নির্মিত হলেও এখনো মহিলারা সামাজিক এবং আর্থিক বিকাশের মূলস্রোত থেকে অনেক পিছেয়ে আছে, মূলতঃ লিঙ্গভেদের কারণেই এই একবিংশ শতাব্দীতেও সামাজিক এবং আর্থিক স্তরে এখনোও মহিলাদের অবস্থান দমনীয় রয়ে গেছে । আজ 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ' - এই ভাব মানবসমাজ বিস্মৃত হয়েছে । তাই বর্তমান সরকারের কর্তব্য সর্বাগ্রে এসমস্ত শৃঙ্খল থেকে স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা, যা প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র স্ত্রীজাতিকে বিশেষতঃ পঙ্গু করে রেখেছে তথা নির্ধারিত নীতিসমূহ এবং আইনগুলিকে শীঘ্র কার্যান্বয়ী করে তোলে ।

উপসংহার :-

এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে । এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত । তাই সভ্যতাসৃষ্টির নূতন এক কল্প আশা করা যাক । এ আশা যদি রূপধারণ করে, তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের শরীর পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে, তবে

তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে, তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃয়কে, উজ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায় । মনে রাখেন নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা-সৃষ্টিশীলতার বিরোধী । সামনে আসছে নতুন সৃষ্টির যুগ । সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে, মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে । অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে । ফললাভের কথা পরে আসবে – এমনকি না আসতেও পারে – কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয় ইতি ।

-: গ্রন্থপঞ্জী :-

1. *ঋগ্বেদসংহিতা* – রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০
2. *মনুস্মৃতিঃ* – জগদীশলাল শাস্ত্রী, মোতিলাল বনারসীদাস, দিল্লী-বারানসী-পাটনা, ১৯৮৩
3. *মনুস্মৃতিঃ* – হরগোবিন্দ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা সংস্কৃত ভবন, বারানসী, ২০১৪
4. *নিরুক্তম্* – উদয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২১ (বঙ্গাব্দ)
5. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা সহ) – স্বামী ভাবঘনানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১
6. *মহাভারতম্* – হরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশ, বিশ্ববাণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৪ (বঙ্গাব্দ)
7. *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্* – পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত প্রকাশন, কোলকাতা, N.D
8. *স্কন্দপুরাণম্* – পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৯৮ (বঙ্গাব্দ)
9. *ভাগবৎপুরাণম্* – গীতাপ্রেস, গোরক্ষকপুর, উত্তরপ্রদেশ, ২০১১
10. *পাণিনীয়ম্* – প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও হৃষিকেশ শাস্ত্রী, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১১
11. *অমরকোষ* – গুরুনাথ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৮ (বঙ্গাব্দ)
12. *উত্তররামচরিতম্* – শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা, ২০১৫
13. *অর্থশাস্ত্রম্* – মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০২
14. *শিশুপালবধম্* – হরোগবিন্দ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারানসী, ১৯৮৪
15. গোপ, যুধিষ্ঠির - *'সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস'*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা,
16. বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ – '*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস'*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষত্, কলকাতা, ২০০৯
17. ভট্টাচার্য, বিমানচন্দ্র – '*সংস্কৃত সাহিত্যে রূপরেখা'*, বিদ্যাদয় লাইব্রেরী প্রইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২
18. মিশ্র, জগদীশ – *'বৈদিকবাঙ্ময়স্যেতিহাসঃ*', চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, ১৯৮৯
19. আপ্টে, বামন শিবরাম – *'সংস্কৃত হিন্দী কোষ'*, মতিলাল বনারসীদাস, ২০১৫
20. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি – 'বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩
21. বসু, যোগীরাজ - '*বেদের পরিচয়'*, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৫
22. ত্রিপাঠী, ব্রহ্মানন্দ – *'কালিদাস গ্রন্থাবলী'*, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, ২০১২
23. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ - *'চাণক্য নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা'*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১০
24. ঝা, সূজন – *অমরকোষ* (Google App Dictionary) (শব্দকল্পদ্রুম-বাচস্পত্যম্-বীলিয়ম-আপ্টে, ডিকশানরী সহিতা), রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, মুম্বাই
25. Star Plus, Hindi Mahabharata, Total Episode – 268, 2013
26. Rahaman, Khaliur - '*Women Empowerment through Decentralized Governance'*, Narayan Printing, Kolkata, 2012
27. Bhaswaraprana, Pravrajika, RKSMVV, '*JOURNAL OF HUMAN SCIENCES'*, Vol. 1, No. 1, Kolkata, 2016